দৈনিক ইনকিলাব

MAY 1 3 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রসঙ্গ : শিক্ষাক্রম ও পরীক্ষাসূচী প্রণয়ন

শিক্ষায় প্রধান উদ্দেশ্য হল, সমাজের চাহিদার প্রেক্ষিতে নবতর ভাবধারা অনুযায়ী শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন সাধন করা আর এই পরিবর্তন ঘটে তাদের জন্য প্রণয়নকৃত শিক্ষাক্রম বা বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করে শিক্ষণ লেখানো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এই বিষয়বস্তু অবশ্যই শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, চাহিদা এবং ধারণ ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করেই রচনা তথা প্রণয়ন করার কথা হলেও বাস্তবে এর অর্থ হয়ে দাঁড়ায় যে, শিক্ষার্থীর ওপর একগাদা পাঠ্য চাপিয়ে দেয়া, যদিও এই পাঠের গ্রহণযোগ্যতা ও কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। বর্তমানের বিশেষত মাধ্যমিক স্তরের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে ফলে হয় যে, শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত আচরণের পরিবর্তন শুধু লেখাপড়া এবং লেখাপড়ার মাধ্যমেই অর্জন মুখ্য হিসেবে পরিগণিত। শিক্ষাক্রমের ওপর যতটা গুরুত্ব আরোপ করা হয় ততটাই কম গুরুত্বের সহিত দেখা হয় সহপাঠক্রমিকের ওপর যা শিক্ষার্থীর আবেগিক, প্রাক্ষেভিক ও সামাজিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য নেতৃত্বসম্পন্ন মানবশক্তি উৎপাদনের একমাত্র হাতিয়ার, শিক্ষার্থীদের ওপর অমানবিক তথা অমনোবিজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হচ্ছে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার সময় বিশেষত এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার রুটিন প্রণয়নে। বর্তমানের পরীক্ষার রুটিনসমূহে অনেক ক্ষেত্রেই কোন বিরতি দেয়া হয় না। পরীক্ষার পূর্বে শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ পাঠটি রিভাইস করবে এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু আমাদের বর্তমানের পরীক্ষাসূচীসমূহে কি এর শিক্ষার্থীর পাঠ রিভাইসের সুযোগ দেয়া হচ্ছে? আমাদের পরীক্ষাসূচী প্রণয়নকারী বিজ্ঞ (!) কুশলীগণ একটা দায়সারা গোছের পরীক্ষা গ্রহণেই ব্যস্ত। পরীক্ষার সময় বিচেনায় আনা হয় কখন ঈদ, কখন পূজা আবার কখনইবা নির্বাচন বা অন্য কোন জাতীয় ইস্যু, তবে বিবেচনা করা হয় না শিক্ষার্থীদের বয়স, চাহিদা, আগ্রহ, ধারণ ক্ষমতা ও প্রবণতার কথা। পরীক্ষার সময় একাধারে শিক্ষার্থীদের পড়ার প্রতি চাপ প্রয়োগের ফলে প্রায়ই শিক্ষার্থীরা অসুস্থ হয়ে ওঠে যা প্রতিনিয়ত ঘটছে। তবে কর্তৃপক্ষ কখনো তা বিবেচনার সহিত দেখে কিনা আল্লাহ মালুম। এখানে একটি পর্যালোচনা উপস্থাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। তা হল শুধুমাত্র এসএসসি এবং এইচএসসি ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীকে একসাথে অনেক নম্বরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সের ক্ষেত্রে একসাথে সর্বাধিক ৮০০ এবং সর্বনিম্ন ২০০ নম্বরের পরীক্ষায় বছর শেষে অংশগ্রহণ করতে হয় যা মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে ১২০০, যদিও দু'বছর শেষে। অন্যদিকে গ্রেডিং পদ্ধতি অনুসৃত যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিস্টার পদ্ধতিতে ৩০০-৪০০ নম্বরে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, মাস্টার্সের ক্ষেত্রেও অনুরূপ। অনার্স এবং মাস্টার পরীক্ষাসূচী প্রণয়নে দু'বিষয়ের মধ্যকার বিরতি দেয়া হয় ১ সপ্তাহ++। তাহলে কেন মাধ্যমিক ক্ষেত্রে এই অবিচার? তাদের ক্ষেত্রে কেন সর্বোচ্চ ৪৮ ঘণ্টা এবং সর্বনিম্ন ১২ ঘণ্টা? তবে কারণটা কি এই যে, মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরা অবুঝ বা তাদের আন্দোলন বা মিছিলের অনভিজ্ঞতা হেতু তাদের কর্তৃপক্ষ ভয় পান না? তাদের প্রতি সুবিচার (!) বা অবিচার এটা কাম্য নয়। অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ব্যাপার যে, অনেক ক্ষেত্রে এমনও অবস্থা পরিলক্ষিত হয় যে, একই দিনে দুই বিষয়ের পরীক্ষা। এ ধরনের খামখেয়ালির জন্যই শিক্ষার্থীরা অনেক ক্ষেত্রে অসদুপায় অবলম্বনে বাধ্য, তা অবশ্যই অস্বীকার করবেন না বিজ্ঞ(!) কর্তৃপক্ষ? কর্তৃপক্ষের এই একঘেয়েমি সিদ্ধান্তে শিক্ষার্থী নির্বিকার, অভিভাবক হয়ে পড়েন চিন্তিত ও হতাশ আর এরই প্রেক্ষিতে পত্রিকায়, আনাচে-কানাচে কিছু লেখালেখি করে ব্যর্থতায় অনেকটা ক্ষান্ত দিয়েছেন। তাদের অনুনয়-বিনয়ে কর্তৃপক্ষের কেন দৃষ্টি আকর্ষিত হচ্ছে না তা আমার জানা নেই। তবে জানি, প্রতিবছর যে হারে ফেলের কৃতিত্ব প্রদর্শন করছেন তাতে কর্তৃপক্ষের মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে গেছে। অনেক প্রচেষ্টার পরও মেরুদণ্ড যেহেতু সোজা করতে পারেননি, তাই বলছি মাঝে মধ্যে আমাদের প্রেসক্রিপশন (বিনামূল্যে) মনে মনে একটু বিবেচনায় আনেন। অবশ্যই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াবিহীন। একটু জাগ্রত হন, গা নাড়া দিয়ে উঠুন, সৃজন ও মননশীল চিন্তাশক্তির একটু চর্চা করুন। আর নয় গোড়ামি বা পাগলামী নয় তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত। শিক্ষাক্ষেত্রে যথাযথ শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষকদের মর্যাদা দিতে শিখুন, যারা সারা বছর শিক্ষার্থীদের নিয়ে কাজ করে। বিবেচনায় আনতে হবে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীর কথা। আমরা চাই সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক একটি শিক্ষা ব্যবস্থা।

এম আজিম মাহমুদ
শিক্ষা মূল্যায়ন ও গবেষণা বিভাগ, আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।